মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর -একটি দার্শনিক আলোচনা

অভিজিৎ রায়

বছর ছয়েক আগের কথা। একবার একটি বাংলাদেশী ই-ফোরামে এক ভদ্রলোকের সাথে দর্শনগত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র ই-ফোরামগুলোতে লেখালিখি শুরু করেছি। ভদ্রলোক আমাকে তার জীবনের একটি ঘটনা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করে বললেন,

গতকাল আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম, পার্টিতে। কিন্তু বেরুতে গিয়ে অযথাই আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই দেখি প্রচন্ড বৃষ্টি। আমার বাড়ীর চারপাশটা বৃষ্টির পানি জমে এমনভাবে ভরাট হয়ে ছিল যে, বন্ধুর বাসায় যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।

এমন সময় আমর বড়র পাশের একট গাছ হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল আর তরপর জমে থাকা পানির উপর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতেই গাছের ডাল-পালা বিল্ডিং এর এখান ওখানে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ে যেতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য - চোখের সামনে দেখলাম বিশাল গাছটি একটা নৌকায় পরিণত হয়ে গেল। এই নৌকায় চেপেই আমি অবশেষে আমার বন্ধুর বাসায় পৌঁছুতে পারলাম। অবাক ব্যাপার, তাই না? নৌকাটি ছিল একদম নিঁখুত, গ্রাম বাংলার মাঝিরা যে নৌকাগুলোয় দাঁড় বায় - একদম সেই রকম। এমন একটা নৌকা নিজে থেকেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই- আমার চোখের সামনে!

'যত সব ননসেন্স' - আপনি হয়ত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠবেন—

'কিভাবে একটা নৌকা কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজে থেকে তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

'আপনার এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরী হয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন যেন দোয়াতের বোতল থেকে কালি নিয়ে ইচ্ছে মত দিস্তে দিস্তে কাগজে ছিটিয়ে দিল আর তা সুন্দর একটা অভিধানে পরিণত হয়ে গেল!'

'কিভাবে নৌকার মত একটা জিনিস কোন পরিকল্পণা ছাড়া, কারো প্রচেষ্টা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

তাহলে অভিজিৎ সাহেব, আমায় বলুন তো যেখান একটা সাধারণ নৌকাই কারা ইচ্ছ ছাড়া নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে আমাদের দেহের মত জটিল সিস্টেম হুট করে কোন কারণ ছাড়াই তৈরী হয়ে যেতে পারে?

কিংবা,

কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্ব কারো উদ্দশ্য বা পরিকপণা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয় যেতে পারে?'

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। যেখানে একটি নৌকা নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্বকে 'সয়ম্ভু' বলে আমরা ভেবে নিতে পারি? কিভাবে ধারণা করতে পারি এই যে সুশৃঙ্খল বিশ্ব, প্রাণী-জগৎ, প্রকৃতি, গ্রহ-তারা এত সব কিছু নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়া? সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছে এ নয়নাভিরাম বিশ্ব? বললেই হল নাকি! মানব-মন সত্যই সায় দিতে চায় না এ ধরনের তথাকথিত 'অবাস্তব' অনুকল্পে। তাই আমাদের এই বিশ্বজগতের পেছনে সত্যিকারের 'পরম-পিতা'জাতীয় কেউ আছেন - এই স্বজ্ঞাত ধারণা তাড়িত করেছে, ভাবিত করেছে যুগে যুগে দার্শনিকদের। ৩৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিস তার একটি লেখায় বলেছিলেন[1] –

> 'প্রাণময় সৃষ্টির মধ্যে এমন পূর্বকল্পিত চিহ্নের অস্তিত্ব সত্তেও আপনি কেমন করে সন্দেহ পোষণ করেন যে এরা পছন্দকৃত বা নকসাকৃত কার্যের ফসল নয় ?'

প্লেটোও ভেবেছেন যে, এই মহাবিশ্ব দেখে বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নক্সাকার (Designer) রয়েছেন। তবে সবচাইতে সুন্দরভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন উইলিয়াম প্যালি নামে এক ধর্মজাজক ১৮০২ সালে তার 'ন্যাচারাল থিওলজি' (Natural Theology) নামের একটি বইয়ে[2] :

> 'ধরা যাক জঙ্গলে চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরী করেছিল?'

প্যালির এই আরগুমেন্টটি দর্শন শাস্ত্রে পরিচিত হয়েছে - সৃষ্টির যুক্তি বা 'আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন' নামে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে বিগত সময়গুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন

[1] 390 B.C., Xenophon, Gk. historian, quotes Socrates, "With such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt that they are the work of choice or design?"
[2] Natural Theology ; Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. Collected from the Appearances of Nature, William Paley, Lincoln-Rembrandt Pub.; 12th edition (August 1, 1986)

ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব 'তৈরীর' পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন 'কারিগরের' হাত থাকতেই হবে; এই ধারণাটি একটা সময়ে আস্তিকদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হত। এখনও বেশ কিছু বাংলাদেশী ফোরামেই এই যুক্তিটি ঈশ্বরের বিশ্বাসের সপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহৃত হয়।

তবে যারা 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের চর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের কাছে কিন্তু প্যালির যুক্তির দুর্বলতা গুলো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। আমি আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬) বইয়ে এ নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এর কিছু তুলে ধরা হল -

১) ঘড়ির কারিগরের পিতা :

ঘড়ির যেমন ঘড়ির কারিগর থাকে, তেমনি প্রত্যেক কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে মহাবিশ্বের কারিগর রূপী ঈশ্বরের পিতাটি কে? এই প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। আর সেই পিতার পিতাই বা কে ছিলেন, আর তার পিতা? - এমনি ভাবে প্রশ্নের ধারা চলতেই থাকবে। এই প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেবে অন্তহীন অসীমত্বের দিকে। বিশ্বাসীরা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বর সয়ম্ভু। তার কোন পিতা নেই, তার উদ্ভবের কোন কারণও নেই। তিনি অনাদি- অসীম। এখন এটি শুনলে অবিশ্বাসীরা/যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, 'ঈশ্বর যে সয়ম্ভু তা আপনি জানলেন কি করে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর সয়ম্ভু বলে ভাবছেন, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রমান্ডেরও সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এটি ভাবতে অসুবিধা কোথায়?' দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের রেজর' (Occam's razor) নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে, যার নিরিখে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটিকে সহজেই সমালোচনা করা যেতে পারে (প্রবন্ধের শেষে *টিকা দ্রষ্টব্য*)।

২) ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, আর নৌকা বানায় নৌকার কারিগর :

আমি প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত ঘটনাতে ফিরে যাই। বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি নৌকা দেখে উক্ত ভদ্রলোকের নৌকাটির পিছনে কারিগর থাকার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু একটি নৌকা দেখে কি কারো মনে হতে পারে যে, একজন ঘড়ির কারিগর নৌকাটি বানিয়েছে? কখনই না। আমদের স্বভাবতই মনে আসে নৌকার কারিগরের কথা। তেমনি ভাবে আমাদের সমাজে আমরা দেখি- জুতা বানায় জুতার কারিগর, ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, সোনার কাজ করে সোনার কারিগর (স্বর্ণকার)। একই কারিগর তো সবকিছু বানাচ্ছে না[3]। একই যুক্তিতে তাহলে আমাদের সৃষ্ট জীবনের জন্য দরকার একজন জীবনীকার, সূর্যের জন্য চাই

[3] হিন্দু শাস্ত্রে এধরণের কারিগরের একটি তালিকা রয়েছে- এদেরকে বলা হয় 'নবশাখ'; বাংলায় এ ৯ জাতি সম্পর্কে যে ছড়াটি প্রচলিত তা হল:

'তিলিমালী তাম্বুলী গোপনাপিত গোছালী
কামার কুমার পুতুলী ইতি নবশাখাবলী।'

অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নবশাখ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

তার মাঝে মালাকার তাঁতি কর্ম্মকার।

'সূর্যকার' (সূর্যের কারিগর), চন্দ্রের জন্য একজন 'চন্দ্রাকার', আর বৃষ্টির জন্য চাই একজন 'বৃষ্টিকার', ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ির জন্য ঘড়ির কারিগরের উপমা নিয়ে শুরু করলেও বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর জন্য যুক্তিহীন ভাবে একজনমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পণা করে থাকেন। এ ছাড়া আমাদের এ মহাবিশ্ব ছাড়াও যদি একাধিক মহাবিশ্ব থেকে থাকে[4], তাহলে একাধিক ঈশ্বর থাকতেই বা বাঁধা কোথায় ?

৩) শুন্য হতে ঘড়িঃ সাইবাবার ম্যাজিক?

ঘড়ি বা নৌকা বানানোর জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নৌকার ক্ষেত্রে কাঠ পাওয়া যায় গাছ কেটে। ঘড়ির ভিতরের কল কব্জাগুলো বানানো হয় লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুথেকে। কিন্তু বলা হয়, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্বতৈরী করেছেন স্রেফ শুন্য হতে (ex Nihilo) । সুতরাং ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি ভুল।

৪)ভুল সাদৃশ্য :

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্যটি আরেকটি কারণে ভুল তা হল, এখানে অবচেতন মনে ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে, যেহেতু দুটি বস্তু একটি কমন বৈশিষ্ট্য বিনিময় করছে, অতএব, তাদের তৃতীয় একটি কমন বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে।

যেমন ধরা যাক নীচের উদাহরনটিঃ

১. ঘড়ির গঠন জটিল
২. ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।
৩. মহাবিশ্বের গঠনও জটিল
৪. সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যক।

শঙ্খকার কুম্ভকার আর কাংস্যকার।।

.. .. ..

সূত্রধর চিত্রকর আর স্বর্ণকার।

ব্রহ্মশাপে নিপতিত ওহে গুণাধার।।

(রেফারেন্স: আদি বাঙালী ঃ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অজয় রায়, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ ১৮৭)। হিন্দুধর্মে আবার একজন মহাকারিগরও রয়েছেন, তিনি বিশ্বকর্মা।

[4] একাধিক মহাবিশ্ব থাকার ব্যাপারটি কোন কল্পকাহিনী নয়। আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি একাধিক বার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ধারণাটি আসলে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানী ট্রিয়ন এবং লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে, সৃষ্টির উষা লগ্নে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (expanding bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শহীন অবস্থায় দূরে সরে গিয়েছে। আমরা সেই সব অসংখ্য মহাবিশ্বেরই একটিতে অবস্থান করছি, অন্যগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে। তবে একাধিক মহাবিশ্ব থাকার এই ধারণাটি সঠিক নাকি ভুল, এটি এ মুহূর্তে জানার উপায় নেই। কিন্তু কেউ যদি সজ্ঞাতভাবে ভেবে নেন, আমাদের এই মহাবিশ্ব ছাড়া আর কোন মহাবিশ্ব নেই, কিংবা তৈরী হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে ট্রিয়ন এবং লিন্ডের গবেষণা থেকে আহৃত সমাধানের ভুল ধরিয়ে দিয়ে নিজের সজ্ঞাত ধারণাটি প্রমানের দায়িত্ব থাকছে তার ঘারেই।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্নায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তির ভুলটি নীচের আরেকটি উদাহরনের সাহায্যে আরো ভালভাবে পরিস্কার করা যায়ঃ

১. পাতার গঠন জটিল
২. পাতা গাছে জন্মায়।
৩. টাকার হিসাব (Money bills) এর গঠনও জটিল
৪.সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে নয়!)।

৫) অসঙ্গতি :

প্যালির আরগুমেন্টে ধরে নেওয়া হয়েছে ঘড়ির গঠন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত পাথর, খনিজ বা পাহাড়-পর্বতের মত সহজ সরল ও বিশৃংখল নয়। তাই তার কারিগর লাগবে। আবার একই সাথে মহাবিশ্বের গঠন ধরে নেওয়া হয়েছে জটিল এবং সুশৃংখল ('সহজ সরল' প্রকৃতি এর একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও)। তাই এটি একটি অসম তুলনা।

৬) চক্রাকার যুক্তি :

'কে বানালো এমন নিখুঁত মহাবিশ্ব?' অথবা, 'বলুন তো, আমাদের তৈরী করেছে কে?'- প্রায়শঃই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যূক্তিবাদীদের। কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তারা বোঝেন না যে, এধরনের প্রশ্ন বিজ্ঞানের চোখে অর্থহীন প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্নটি হবে 'এই সৃষ্টি রহস্যের প্রক্রিয়াটি কি?' বা 'আমাদের জীবন গঠনের মূল প্রিন্সিপালটি কি?' এবং বিজ্ঞান সর্বদাই এধরনের প্রশ্নের উত্তর খুজতে সচেষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ পরিস্কারভাবেই জানে যে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোন 'ঈশ্বর' নামক কোন 'বড় বাবু' নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সহজ সুত্রাবলী (Laws of Physics)। আসলে এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই ঘটছে।

প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক কারো পক্ষেই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। আমি আমার বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'তে বলেছিলাম, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া জ্ঞান থেকে বলা যায় 'ঈশ্বর' বলে কাউকে আভিহিত করতে চাইলে তা করা উচিত আসলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণহীন সূত্রগুলিকে[5]।

[5] স্পিনোজা এবং আইনস্টাইন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন তা হচ্ছে এই প্রাণহীন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ঈশ্বর, মহাবিশ্বের কারিগররূপী কোন ব্যক্তিসত্ত্বা নয়। এ প্রসঙ্গে কার্ল স্যাগান তার 'God Hypothesis' প্রবন্ধে লেখেন – 'Einstein was constantly interpreting what God would or what God wouldn't do. But by *God* they meant something not very deferent from the sum total of physical laws of the universe; that is gravitation plus grand unified field theories plus a few other things equaled God'.

প্যালির এই 'আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন' পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি এক সময় উৎসাহের সাথে ব্যবহৃত হত জীববিজ্ঞানেও। প্রানীদেহের চোখ, কান প্রভৃতি অংগ প্রত্যংগ দৈবাৎ কোন বিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় নিজে থেকে তৈরি হয়ে যেতে পারে না বলে মনে করা হত। প্যালি নিজেও বলেছেন, কোন ধরনের পরিকল্পনাবিহীন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হয়তো আঁচিল, আঁব, জরুল, তিল, ব্রণের মত জিনিসপত্র তৈরী হতে পারে, কিন্তু কোনভাবেই চোখ নয়। ডারউইনের 'বিবর্তনতত্ত্ব' রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত এ ধরণের যুক্তি খুব জোরালো যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু ১৮৫৯ সালে ডারউইন-ওয়ালেস প্রস্তাবিত 'প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনতত্ত্ব' আক্ষরিক অর্থেই জীববিজ্ঞানে প্যালির 'ডিজাইন আর্গুমেন্টের' বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ডারউইন প্রমান করলেন চোখ বা এমনি ধরনের ধরণের জৈবিক উপাঙ্গের উদ্ভবের পেছনে ডিজাইন বা পরিকল্পনার মত ঐশ্বরিক 'উদ্দেশ্য' না খুঁজে প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে। পাঠকেরা এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের 'The Blind Watchmaker' বইটি দেখতে পারেন। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বন্যা আহমেদ তার 'বিবর্তনের পথ ধরে' বইয়ে (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ হাজির করে প্যালির সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ ডারউইন আসার পর 'বলুন তো, আমাদের কে বানিয়েছে?' ধরনের অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের সময় ব্যয় করতে হয় না। কারণ, এ তত্ত্ব আমাদের দেখিইয়েছে যে, মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণী কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল জীব থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভুত হতে পারে। এ জন্যই দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বিবর্তনতত্ত্ব নামের 'বিপজ্জনক প্রস্তাব'টিকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত ধর্মীয় ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে[6]।

বিশ্বাসীদের তরফ থেকে করা 'কে আমাদের বানিয়েছে' এ ধরনের প্রশ্ন আরেকটি কারণে অর্থহীন তা হল, এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে উত্তরটি আগে থেকেই গ্রহন করে নেয়া হয়েছে -'কে আবার বানাবে - ঈশ্বর!'। এটি

[6] জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্যালির য্যক্তির খন্ডন সম্বন্ধে আরো বিষদভাবে জানতে চাইলে এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত প্রবন্ধ 'আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কি হচ্ছে?' দেখুন ।

নিঃসন্দেহে একটি ‘লোডেড কোশ্চেন’। অর্থাৎ ঈশ্বর আছে এটা ধরে নিয়েই এধরনের প্রশ্নকরে উত্তর খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের চক্রাকার প্রচেষ্টা। মুক্তমনা সদস্য এবং পদার্থবিদ অপার্থিব জামান তার ‘Who Created you?’ পবন্ধে ব্যাপারটি খুব পরিস্কার ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন[7] :

> “আপনকে কে সৃষ্টি করেছে’ এ ধরণের প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না, কারণ প্রথমত প্রশ্নটির মধ্যেই এর উত্তর ধরে নেওয়া হয়েছে- যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। এবং যদি সৃষ্টিকর্তা থেকে থাকেন তাহলে প্রশ্নটির উত্তর এক ধরণের পুনরুক্তি (tautology) ছাড়া আর কিছু নয়; সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সৃষ্টি করেছে। সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে প্রশ্নকারী সৃষ্টিকর্তার নাম জানার জন্য প্রশ্নটি করেন নি। সুতরাং এটি একটি অর্থহীন প্রশ্ন। আমি যে বলেছি যথার্থ প্রশ্ন হল জীবন সৃষ্টির কারণ এবং প্রক্রিয়াটি কী (কে নয়), যদি কোন কারণ থেকে থাকে। এবং উত্তর হল যা আমি উপরে দিয়েছি (যার সাথে অধিকাংশ নামকরা পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানীরা একমত)।”

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রাকৃতিক বিভিন্ন ‘দৈব’ ঘটনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে নানা ধরনের ‘অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বার’ কল্পনা করে নিয়েছে মানুষ। বনে হঠাৎ দাবানলে সমস্ত কিছু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তখন ভয়ে পেয়ে মানুষ এর পেছনে ‘অগ্নি দেবীর’ কল্পনা করে নিয়েছে[8]। পুজো-অর্চ্চনা করে সেই দেবীকে তুষ্ট করতে চেয়েছে বারেবারেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায়। বৃষ্টি কেন হয় এ ব্যাপারটিও এক সময় মানুষের জানা ছিল না। তাই ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রনের জন্য মুসলিমরা যেমনি ‘মিকাইল ফেরেস্তার’ কল্পনা করেছে হিন্দুরা করেছে ‘দেবরাজ ইন্দ্রের’ এবং ‘বরুণের’ কল্পনা। কিন্তু আজ স্কুলের ছোট ছেলেটিও জানে মিকাইল ফেরেস্তা বা ইন্দ্রের হাতের কারসাজিতে নয়, বৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে জলচক্র (Water Cycle) অনুসরন করে। কিভাবে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, কিভাবে তা মেঘে পরিনত হয়, আর কিভাবে তা আবার বারিধারায় রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে তা আজ প্রাইমারী স্কুলের বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটা কিভাবে শূন্যে ঝুলে থাকে তা একসময় মানুষের জানা ছিল না, রহস্য সমাধান করতে গিয়ে আমরা ধরিত্রী মাতাকে বসিয়েছি কখনও অদৃশ্য গরুর শিং এর উপর অথবা দৈত্যাকার কোন কচ্ছপের পিঠে[9] কিংবা মহাসর্প বাসুকীর ফণার উপর। কিন্তু আজকের স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররাও এটলাস-গরু-কচ্ছপ ছাড়াই স্রেফ নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র খুব ভালভাবেই শুন্যপথে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচলন ব্যাখ্যা করতে পারে। মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মানুষ একসময় কল্পনা করেছে ‘অদৃশ্য আত্মার’। কল্পনা করেছে যমদূত বা আজরাইলের মত কাল্পনিক চরিত্রের। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আজরাইলের প্রাণহরনের গালগপ্প বা আত্মার অমরত্ব ছাড়াই প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুন দিয়ে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। এ বিষয়ে আরো বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে, উৎসাহী পাঠকেরা আমার আর ফরিদ আহমেদের লেখা ‘মহাবিশ্বে

---

[7] মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে অপার্থিবের প্রবন্ধ ‘Who Created you?’ দ্রষ্টব্য।

[8] যেমন, আর্য নামে পরিচিত প্রাচীন কৌম জনগোষ্ঠী বেদে ’অগ্নি’ দেবতার কল্পনা করেছিলেন।

[9] বার্টাণ্ড রাসেল সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প চালু আছে। তিনি একবার সৌর জগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সহ গ্রহরাজী কিভাবে শূন্যে ঝুলে থেকে সূর্যকে পরিভ্রমণ করছে এবং সূর্য কিভাবে আবার আমাদের ছায়াপথে ঘুরছে তা নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে এক বৃদ্ধা উঠে দাড়িয়ে বলে উঠলেন, ‘এতক্ষণ তুমি বলেছ- সব বাজে কথা। পৃথিবী আসলে সমতল, আর রয়েছে একটি বিরাট কচ্ছপের উপর।’ রাসেল হেসে বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুরলেন, ‘কচ্ছপটা তাহলে কার উপর দাঁড়িয়ে আছে ?’ বৃদ্ধার জবাব, ’ছোকরা, তুমি খুব চালাক। তবে জেনে রেখ, কচ্ছপটার তলায় আরেকটা কচ্ছপ, আর ওইটার তলায় আরেকটা- এভাবে পরপর সবই কচ্ছপ রয়েছে। এ এক অনন্ত অনুক্রম!

প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' বইটি (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) পড়ে দেখতে পারেন। এ ছাড়া এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত 'আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?' দ্রষ্টব্য।

এটা ঠিক যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্ত্বাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুজতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভুমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে 'God in gaps'। একটা উদাহরণ দেই। সৃষ্টির আদিতে অ্যামিনো এসিডের মত জটিল অনু কিভাবে তৈরী হল তার পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো আমাদের অজানা। বিশ্বাসীরা স্বভাবতই এর পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার ব্যাপারটি নির্দ্বিধায় মেনে নেন। এটা অনেকটা প্রাচীনকালে বৃষ্টি কিভাবে হয় তা বুঝতে না পেরে এর পেছনে 'মিকাইল ফেরেস্তা'কে কল্পনা করে গোঁজামিল দেওয়ার মত ব্যাপার। আমরা জানি, যতই বিজ্ঞান এগুচ্ছে এই ধরনের ফাঁক ফোকর থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা ভরাট করবার চেষ্টা করছে। কারণ মানুষ জানে ঈশ্বর বা অন্য কাল্পনিক সত্ত্বাকে হাজির করে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা আসলে অজ্ঞানতার সামিল। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন তার 'নতুন মানব সমাজ' গ্রন্থে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন[10] -

> 'অজ্ঞতার অপর নামই হল ঈশ্বর। মানুষ তার অজ্ঞতাকে সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পায় তাই ঈশ্বর নামক একটি সম্ভ্রান্ত নাম খুঁজে বের করেছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের অপর কারণ মানুষের অসামর্থ্য এবং অসহায়তা।'

খুবই সত্যি কথা। 'ঈশ্বর কোন কিছু বানিয়েছেন' দাবী করা আসলে ঘুরিয়ে পেচিয়ে স্বীকার করে নেওয়া যে - 'আমি জানি না'। পাঠকদের অনেককেই হয়ত স্কুল জীবনে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় 'আকাশ নীল কেন' বা 'রংধনু কিভাবে তৈরী হয়' - এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা স্বভাবতই এ ধহরনের প্রশ্নের উত্তরে অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণগুলোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন পরীক্ষার্থী যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে 'আকাশ নীল কারণ আল্লাহ আকাশকে নীল করে তৈরী করেছেন '- এ ধরনের উত্তর পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে, তবে সে কত নম্বর আশা করতে পারে? স্রেফ শূন্য। পরীক্ষক ধরেই নেবেন যে 'আকাশ নীল কেন' এই প্রশ্নের উত্তর সেই পরীক্ষার্থী জানে না, তাই আবোল-তাবোল লিখছে। কাজেই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল তার উত্তরে কেউ ঝদি বলেন 'ঈশ্বর বানিয়েছেন' তবে তা হবে আসলে ওই পরীক্ষার্থীর উত্তরের মতই হাস্যকর এবং অজ্ঞতাসূচক। তাই দর্শনের পরিভাষায় এই ধরনের কুযুক্তিকে বলে 'Argument from ignorance' বা 'অজ্ঞতাপ্রসূত যূক্তি'।

[10] নতুন মানব সমাজ (প্রবন্ধ সংকলন), রাহল সাংকৃত্যায়ন, (অনবাদ: শম্ভুনাথ দাস), বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিকালস, কলকাতা, বাংলা ১৩৭৫, ১৯৬৮ পৃ: ২৮। মূল গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে জেলখানা থেকে 'তুমহারি ক্ষয়' নামে হিন্দীতে লেখা।

এবার দর্শন থেকে একটু বিজ্ঞানের জগতে পা রাখা যাক। আমরা জানি, আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অসীম ঘনত্বের এক উত্তপ্ত পুঞ্জিভূত অবস্থা {যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)} থেকে সৃষ্ট। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাং-এর পর মুহুর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন, মূল ধারার অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতেন। তারা বলতেন, বিগ-ব্যাং-এর আগে কি ছিল এ প্রশ্নটি 'উত্তর মেরুর উত্তরে কি আছে?' বলার মতই শোনাবে। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সুত্রগুলো দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এ ব্যাপারটিকে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন[11] –

> 'অদ্বৈততা হল এমন একটি জায়গা যেখানে এসে স্থান ও কালের সনাতনী ধারণাগুলি ভেঙে পড়ে, যেমন ভেঙে পড়ে পদার্থবিজ্ঞানের সকল জ্ঞাত নিয়ম। এর কারণ হল এসব নিয়ম সূত্রায়ন করা হয়েছিল সনাতনী স্থান-কালের পটভূমিতে। .. .. এই ভেঙেপড়াটি কিন্তু কেবল সঠিক তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা প্রসূত নয়, বরং (অদ্বৈতার) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম বলতে পারার আমাদের সামর্থ্যরে মৌলিক সীমাবদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করে এটি। এই সীমাবদ্ধতা সাধারণ কোয়ন্টাম মেকানিক্যাল অনিশ্চয়তা নীতি র্কতৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতার সদৃশ এবং অতিরিক্ত।'

তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে, ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তা করেছেন এক উদ্দেশ্যবিহীন এবং নিয়ম বিহীন অবস্থা (অদ্বৈত বিন্দু) থেকে। বিশ্বাসীরা সর্বদাই এই মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির সৃষ্টির পেছনে এক মহাবুদ্ধিমান এক অজ্ঞাত সত্ত্বার 'সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য' এবং 'অভাবিত দিক নির্দেশনার' সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি কোন নির্দিষ্ট কারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনই তবে তিনি তা উদ্দেশ্যবিহীন (purposeless) নিয়মবিহীন (lawless) এবং বিশৃংখল (chaotic) অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে যাবেন কেন? তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো হওয়া উচিৎ অনেক বাজ্ময়, ব্যাপ্ত, উদ্দেশ্যমূলক এবং নিশ্চয়তাপ্রদানকারী। কিন্তু বাস্তবতাটি ঠিক উলটা। দার্শনিক কুয়েন্টিন স্মিথ (Quentin Smith) তাই তার 'Simplicity and Why the Universe Exists' প্রবন্ধে বলেন[12] –

> 'বলা হয়ে থাকে যে, ঈশ্বর ইচ্ছে করলেই বিশ্বসৃষ্টি মুহূর্তে অদ্বৈতবিন্দুতে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন, এবং ঠিক করে দিতে পারতেন যে, এটি বিগ-ব্যাং আকারে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হবে আর তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে থাকবে এমন সব নিয়মাবলী এবং জাগতিক শর্তাবলী, যা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু এ ধরণের বক্তব্য অযৌক্তিক, কারণ এভাবে যদি মহাবিশ্ব আর পরবর্তীতে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে সেটি করা হবে একটি অযৌক্তিক পন্থায়; এমন ধরণের অদ্বৈত বিন্দু সৃষ্টির

[11] Stephen Hawking, Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse', *Physical Review* D 14, 2460 (1976).
[12] Quentin Smith, Simplicity and Why the Universe Exists, Philosophy 71 (1997): 125-32.

> পেছনে কোন যোউক্তিক ভিত্তি থাকতে পারে না। কারণ এ থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল পেতে হলে বাইরে থেকে কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়েইনবার্গের কথায়ও লক্ষ্য করা যায় একই সুর[13] :

> 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোন মুর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের অনেকেই ভেবে নেন যে সৃষ্টির আদিতে শুন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি স্রেফ অলৌকিক একটি ব্যাপার - এবং এই ব্যাপারটি কেবল 'ঈশ্বর' নামক একটি সত্ত্বার 'ভেল্কিবাজি' দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। এমনভাবে ভাবার কারণও আছে। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি শুন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে - এই যে আমরা আজ চোখের সামনে পরিচিত পদার্থ আর শক্তির জগৎ দেখছি তার উদ্ভব কোথা থেকে ঘটল? কিভাবে শূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি হল? কিভাবে তৈরী হল আমাদের এ বিশ্বজগৎ?

আসলে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হলে আমাদের স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ চুকিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পাঠ নিতে হবে। ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা একটু জটিল। সহজ বাংলায় বললে বলতে হয়, 'শুন্য থেকে কোন পদার্থ তৈরী হয় না'- এ ধারণাটি চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের জগতে হয়ত সত্য, তবে কোয়ান্টাম পদার্থের জগতে সত্য নয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছে যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসরন করে শুন্য থেকে পদার্থ ও শক্তি তৈরী হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন' (vacuum fluctuation)।

'রহস্যময়' এই শূন্য শক্তি কিংবা ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তা তত্ত্বের কাঁধে ভর করে। ১৯২৭ সালে জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ গানিতিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, কোন বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ যুগপৎ একসাথে নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বস্তুর অবস্থান ঠিক ঠাক মত মাপতে গেলে দেখা যাবে, ভরবেগের তথ্য যাচ্ছে হারিয়ে, আবার ভরবেগ চুলচেরা ভাবে পরিমাপ করতে গেলে বস্তুর অবস্থান অজানাই থেকে যাবে। কাজেই হাইজেনবার্গের এই সূত্র সত্যি হয়ে থাকলে, এমনকি পরম শূন্যেও একটি কণার 'ফ্লাকচুয়েশন' বজায় থাকার কথা, কারণ কণাটি নিশ্চল হয়ে যাওয়ার অর্থই হবে এর অবস্থান এবং ভরবেগ সম্বন্ধে আমাদেরকে নিশ্চিত তথ্য জানিয়ে দেওয়া, যা প্রকারন্তরে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের লংঘন।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং লেখক পল ডেভিস তার একটি বইয়ে উল্লেখ করেছেন[14],

---

[13] এ বইয়ের স্টিভেন ওয়েইনবার্গ-এর (দিগন্ত সরকার অনুদিত) 'পরিকল্পিত মহাবিশ্ব?' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

[14] *God and the New Physics*, Paul Davies, J.M. Dent & Sons, London, 1983, p 162

> "প্রাত্যহিক জগতে শক্তির পরিমান অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থির; চিরায়ত পদার্থবিদ্যার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হল 'শক্তির নিত্যতা' নীতি (law of energy conservation)। কিন্তু কোয়ান্টাম আণুবীক্ষণিক জগতে শক্তি অনস্তিত্ব থেকে (nowhere) স্বতঃস্ফুর্থভাবে এবং অনিশ্চিতভাবে আবির্ভূত এবং অদৃশ্য হতে পারে।"

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রিয়ন (Edward Tryon), একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে ১৯৭৩ সালে[15]। তবে তারও আগে 'বিগ-ব্যাঙের জনক' গ্যামোর মাথাতেও ধারণাটি এসেছিল। গ্যামো তার 'My World line' গ্রন্থে ১৯৪০ সালে আইনস্টাইনের সাথে কথোপকথনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। গ্যামো খুব হাল্কা চালে সেদিন আইনস্টাইনকে বলেছিলেন[16], 'আমার এক ছাত্র সেদিন আপনার সমীকরন গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলো যে একটি নক্ষত্র কিন্তু স্রেফ শূন্য থেকে উদ্ভুত হতে পারে, কারণ আপনার সমীকরনে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষন শক্তি ধণাত্মক ভর-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।' শুনে আইনসটাইন একটু থমকে দাড়ালেন। গ্যামো বললেন, 'আমরা ওই সময় দুজনে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, আর এত গাড়ি ঘোড়ার ভীরে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল' ।

আমরা জানি পদার্থের ভর এবং শক্তি সম্পর্কিত হয় আইনসটাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ দিয়ে। যদি পর্যাপ্ত শক্তি বিদ্যমান থাকে, ফোটন থেকে যে কোন সময় পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল তৈরী হতে পারে। এর নাম 'যুগল উৎপাদন' (pair production) এবং এই ব্যাপারটিই মহাবিশ্বের ভর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ট্রিয়নের ধারণা অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে শূন্যাবস্থা থেকে বড় সড় এক ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে আনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্যদেশকে আপাতঃ দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তৈরী হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকটন এবং পজিটন (কণিকা- প্রতিকণিকা যুগল) থেকে পদার্থ তৈরী হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটার স্থায়ীত্বকাল মাত্র $১০^{-২১}$ সেকেন্ড। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত কোন রূপকথার জীব নয়, নয় কোন গানিতিক বিমূর্ত মতবাদ; বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন। একটি প্রমাণ হচ্ছে 'ল্যাম্ব শিফট', যা

---

[15] *Is the Universe a Vacuum Fluctuation?*, E. P. Tryon, Nature 246(1973), 396-97

[16] George Gamow, *My World Line: My world line; an informal autobiography*, Viking, New York, reprinted 1970; Also see: Inflation for Beginners, John Gribbin, http://aether.lbl.gov/www/science/inflation-beginners.html

আহিত পরমাণুর মধ্যস্থিত দুটো স্তরে শক্তির তারতম্য প্রকাশ করে। তবে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের সবচেয়ে জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিখ্যাত 'কাসিমিরের প্রভাব' থেকে [17]।

রিচার্ড মরিসের ভাষায়[18],

> 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে 'শূন্যতা' বলে আসলে কিছু নেই। এমনকি বিশুদ্ধ শুন্যস্থানেও প্রতিনিয়ত অসদ কণিকা বা ভার্চুয়াল পার্টিকেল যুগল ক্রমাগত উদ্ভুত হচ্ছে, আবার বিনাশ পাচ্ছে। এই সব কণিকার অস্তিত্ব কোন গানিতিক কল্পণা নয়। যদিও এদেরকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলোর কার্যকর প্রভাব খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তব। এদের অস্তিত্বের অনুমিতির ভিত্তিতে যে সব ভবিষ্যদ্বানীতে উপনীত হওয়া গেছে, তা কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খুব নিখুঁত ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।'

তবে ট্রিয়ন প্রথমে যে ভাবে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন, তাতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ায় ১৫০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। আর দ্বিতীয়তঃ এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যস্থান (empty space) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়- আদিতে সেই শূন্যস্থানই বা এলো কোথা থেকে (পাঠকদের এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত অনুযায়ী, মহাবিশ্ব স্থান-কালের বক্রতার প্রকাশ)। ১৯৮২ সালে আলেকজাণ্ডার ভিলেঙ্কিন (Alexander Vilenkin) এর একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে[19] - মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই 'শূন্য' থেকে - তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু 'জড়হীন' শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময়শূন্যতা এবং স্থানশূন্যতাও বটে। ভিলেঙ্কিন কোয়ান্টাম টানেলিং এর ধারণাকে ট্রিয়নের তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে অশূন্য অবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে মহাস্ফীতির বা ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মত আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মহাস্ফীতির ধারণাটিকে আশির দশকের শুরুতে আরো দৃঢ় গানিতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী আদ্রে লিন্ডে (Andre Linde) এবং আমেরিকার অ্যালেন গুথ (Alan Guth)[20]। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে শূন্য অবস্থা থেকে কিভাবে আমাদের এ মহাবিশ্বের উদ্ভব আর বিস্তার ঘটতে পারে তা সাধারণ পাঠকদের জন্য সাধারণ ভাষায় তুলে ধরেছেন স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত 'দি ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে[21]:

> 'মহাবিশ্বে এই পরিমাণ জড়পদার্থ কেন রয়েছে তা মহাস্ফীতির ধারণা দিয়ে ব্যখ্যা করা যায়। মহাবিশ্বের যে সব অঞ্চল আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেখানে রয়েছে দশ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন (অর্থাৎ ১ এর

[17] 'কাসিমির এফেকট' - ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিখ কাসিমিরের ভবিষ্যদ্বানী, যা পরবর্তীতে মার্কস স্প্যার্ণে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

[18] Richard Morris, *The Edges of Science*, New York, Prentice Hall, 1990, p25

[19] Alexander Vilenkin, *Creation of Universe from Nothing*, Physics letters 117B (1982) 25-28

[20] বিস্তারিত ভাবে জানতে পড়ুন, Alan Guth, *The Inflationary Universe*, Basic Books, March 17, 1998

[21] Stephen W. Hawking, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York: Bantam, paper back ed. 1988, p. 136.

> পিঠে আশিটি শূন্য = ১.০ x ১০^{৮০}) সংখ্যক জড়-কণিকা। কোত্থেকে এগুলো সব এলো? এর উত্তর হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তি থেকে কণিকা ও তার প্রতি-কণিকা এই যুগ্ম আকারে কণিকা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই শক্তি এল কোত্থেকে? এরও উত্তর হল মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ হল শূন্য। মহাবিশ্বে জড় সৃষ্টি হয়েছে ধনাত্মক শক্তি থেকে। অবশ্য জড়পদার্থ মহাকর্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আকর্ষণ করছে। দুটি বস্তুখণ্ড যখন কাছাকাছি থাকে তখন তাদের শক্তির পরিমাণ যখন তারা অনেক দূরে থাকে তা থেকে কম। এর কারণ হল এদেরকে পৃথক করতে হলে যে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা তারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সেই বলের বিরুদ্ধে আপনাকে শক্তি ব্যয় করতে হবে। তাই এক অর্থে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের রয়েছে ঋণাত্মক শক্তি। এমন একটি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে, যা মোটামুটি স্থানিক সুষম (approximately uniform in space), দেখান যেতে পারে যে এই ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি জড়ের প্রতিনিধিত্বকারী ধনাত্মক শক্তিকে নিখুঁতভাবে বিলুপ্ত করে দেয়। কাজেই মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ সব সময়ই শূন্য।'

স্ফীতি বা ইনফ্লেশন তত্ত্বের আবির্ভাবের পর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান খুব পরিস্কারভাবেই আমাদের দেখিয়েছে মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য; মহাবিশ্বের মোট গতিশক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের ঋণাত্মক শক্তি পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এর মানে হচ্ছে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি'র জন্য বাইরে থেকে আলাদা কোন শক্তি আমদানী বা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় নি। সহজ কথায়, ইনফ্লেশন ঘটাতে যদি শক্তির নীট ব্যয় যদি শূন্য হয়, তবে বাইরে থেকে কোন শক্তি আমদানী করার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যালান গুথ এবং স্টেইনহার্ট নিউ ফিজিক্স জার্নালে (১৯৮৯) দেখিয়েছেন, ইনফ্লেশনের জন্য কোন তাপগতীয় কাজের দরকার পড়ে না। মুলতঃ ১৯৮১ সালের পর থেকে বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্নিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে[22]। সাধারণ পাঠকদের জন্য পেপারগুলো অতিরিক্ত প্রায়োগিক এবং জটিল মনে হতে পারেই, কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটির উল্লেখ এ কারণেই করা হল, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, বহু বিখ্যাত পদার্থবিদই আজ স্রেফ শুন্যাবস্থা থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপাত্তির সম্ভাব্যতার এই বৈজ্ঞানিক ধারণাটির উপর জোর নজর দিচ্ছেন, হাস্যকর বা 'ননসেন্স' ভেবে কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না।

---

[22] উদাহরণ হিসেবে এখানে বোইজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত কিছু পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :

David Atkatz and Heinz Pagels, "*Origin of universe as Quantum Tunneling effect*" Physical review D25 (1982): 2065-73;

S.W. Hawking and I.G.Moss "*Super cooled Phase Transitions in the very early Universe*", Physics letters B110(1982):35-38;

Alexander Vilenkin, "*Creation of Universe from Nothing*" Physics letters 117B (1982) 25-28,

Alexander Vilenkin, "*Quantum Origin of the Universe*" Nuclear Physics B252 (1985) 141-152,

Andre Linde, "*Quantum creation of the inflationary Universe*," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405

Victor Stenger, "*The Universe: the ultimate free lunch*", European Journal of Physics 11 (1990) 236-243.

etc.

ভিক্টর স্টেংগর পেশায় ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান' বিভাগের ইমারিটাস অধ্যাপক এবং কলারাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স' এরও প্রেসিডেন্ট আর নেশায় যুক্তিবাদী। তিনি আমাদের মুক্তমনা ফোরামের একজন সম্মানিত সদস্য। আমাদের এই বইটিতেও ভিক্টর স্টেংগরের বেশ কিছু চিন্তা জাগানো প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি ২০০৩ সালে প্রকাশিত তার 'Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe' বইটির 'The Uncreated Universe' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যতার সূত্র লংঘন না করেই কিভাবে শূন্য থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হতে পারে; এবং এর মধ্যে 'অলৌকিকত্ব' কিছু নেই। তার ভাষায়-

> 'অন্য কথায়, মহাবিশ্ব "সৃষ্টিতে" বাইরে থেকে কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নি। অধিকন্তু, এটি হল মহাস্ফীতি মহাবিশ্বতত্ত্বেরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, যদি শূন্য শক্তির একটি প্রাথমিক শূন্যতা (void) থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে শক্তির নিত্যতার লংঘন হয় না।'

তিনি তাঁর অভিমতকে আরো বিস্তৃত করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত 'God: The Failed Hypothesis' বইয়ে[23]। বইটি এ বছরের নিউইয়র্ক টাইমস-এর বেস্ট সেলার। তিনি বইটির 'কসমিক এভিডেন্স' অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, পদার্থের উৎপত্তি, মহাবিশ্বের উদ্ভব, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎপত্তি, মহাবিশ্বের শৃংখলা, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ – যে গুলোকে কিছুদিন আগেও মানুষের বুদ্ধির অগম্য অন্তিম রহস্যময় সমস্যা বলে ভাবা হত, দেওয়া হত অলৌকিক কিংবা ঐশ্বরিক প্রলেপ, সেগুলোকে আজ পদার্থবিজ্ঞানের জানা জ্ঞানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মুক্তমনায় ড. স্টেংগরের 'কসমিক এভিডেন্স' অধ্যায়টির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবন্ধ রাখা আছে; অনলাইনে প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে[24]।

শূন্য থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা ছাড়াও আরো দুটো সম্ভাবনাও আধুনিক বিজ্ঞানে স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরকের প্রস্তাবিত চক্রাকার বা 'সাইক্লিক' মডেল। স্ট্রিং তত্ত্বের দুই সমান্তরাল ব্রেনের ক্রমিক সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এ সাম্প্রতিক তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, শেষ নেই। ট্রিলিয়ন বছরের ব্যপ্তিতে ঘটা ব্রেনের সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয় পদার্থ এবং শক্তির, যে ঘটনাকে আমরা বিগ ব্যাং নামে অভিহিত করি। বিগ ব্যাং যে একবারই ঘটেছে তা নয়, ট্রিলিয়ন বছর পর পর এ ধরনের বিগ ব্যাং ঘটতে থাকবে অন্তহীন চক্রের আবর্তে। তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক তত্ত্ব হল, জুলিয়ান বার্বারের 'দ্য এন্ড অব টাইম'- এর মুল কথা হচ্ছে *সময়* বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই – এটি মস্তিস্কসঞ্জাত এক ধরনের প্রহেলিকা বা বিভ্রম। আর সে জন্যই বিগ 'ব্যাং-এর আগে কি ছিল' – এই সমস্যাকে এর আগে যৌক্তিকভাবে সমাধান করা যায় নি। যতবারই 'সময়'এর উৎসকে আমরা ধরতে গেছি – আঙ্গুলের ফাঁক গলে তা বেরিয়ে গেছে – মরুভূমির

[23] Victor J. Stenger, *God: The Failed Hypothesis: How Science Shows that God Does Not Exist*, Prometheus Books (2007)
[24] Victor Stenger, The Scientific Case Against A God Who Created The Universe, Mukto-Mona.

মরীচিকার মত। কারণ বার্বারের গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসছে -সময় বলেই যে আসলে কিছু নেই! অ্যাডাম ফ্রাঙ্ক ডিস্কভার ম্যাগাজিনের মার্চ সংখ্যায় (২০০৮) মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তারকারী এ সময়কার তিনটি তত্ত্ব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন[25]। এখন মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং অস্তিত্বের পেছনে কোন্ তত্ত্বটি সঠিক, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কারিগরী অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে; তবে এটি ঠিক যে, এ তিনটি তত্ত্বের কোনটিই কোন আলৌকিক সত্ত্বার হস্তক্ষেপকে গোনায় এনে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করছে না, বরং ব্যাখ্যা করছে পদার্থবিজ্ঞানের জানা জ্ঞানের সাহায্যেই। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক উপায়ে মহাবিশ্বের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করে তৈরি করা হয়ছে বহু গাণিতিক মডেলও[26]। 'মহাবিশ্ব কখনোই প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভুত হতে পারে না, এর জন্য কোন অলৌকিক হস্তক্ষেপ লাগবেই' - এ বৈজ্ঞানিক মডেলগুলো এ সজ্ঞাত বিশ্বাস নির্ভর ধারনাকে নস্যাৎ করার জন্য এ মুহূর্তে যথেষ্ঠ।

মহাবিশ্বের উৎপত্তির পাশাপাশি শৃংখলা বা জটিলতা বৃদ্ধির বিষয়টিও আলোচনায় আনা দরকার। অনেকে কিছুদিন আগেও প্রকৃতিতে বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো অবস্থা থেকে শৃংখলায় উত্তোরনের বিষয়টিকে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লংঘন বলে ভাবতেন। বিশেষত জীবকোষের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বিবর্তনের বিরুদ্ধে এটি অনেকের কাছেই খুব আকর্ষনীয় 'যুক্তি' হিসেবে বিবেচিত হত; তারা ভাবতেন একমাত্র 'ঐশ্বরিক কারণ' ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা দেখেছি তাদের এ অনুমান ভ্রান্ত। তাপগতিবিদ্যার তিনটি সুত্র আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটি বলছে : 'তাপ কখনও নিজে থেকে শীতল বস্তু হতে গরম বস্তুতে যেতে পারে না।' সূত্রটিকে অনেক সময় এভাবেও বলা হয় : 'একটি বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কখনও কমতে পারে না।' এনট্রপি ব্যাপারটিকে অনেকসময় সাদামাটাভাবে বিশৃঙ্খলা বা disorder হিসেবে দেখানো হয়। এনট্রপি কমার অর্থ হচ্ছে সাদামাটা ভাবে বিশৃংখলা কমা। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কমতে পারবে না, বাড়তে হবে।

বোঝা যাচ্ছে যে, তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি যে ভাবে বলা হচ্ছে তা শুধু বদ্ধ সিস্টেমের জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের বাসার ফ্রিজের উদাহরণটি হাজির করা যায়। আমরা সবাই জানি যে, ফ্রিজে তাপকে 'উল্টো দিকে' চালিত করা হয়, অর্থাৎ, গরম জিনিসকে ঠান্ডা করা হয় - ফলে সেখানে পানি জমে বরফ হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে রেফ্রিজেটরের ভিতরে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু তাপকে এই 'উল্টো দিকে' চালিত করার জন্য রেফ্রিজেটরকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। কাজ করবার শক্তিটুকু ফ্রিজটি কোথা হতে পায়? রেফ্রিজেরটের পেছনে লাগানো মোটর আর কিছু জ্বালানী এই শক্তিটুকু সরবরাহ করে। কিন্তু এই শক্তিটুকু সরবরাহ করতে গিয়ে তারা ঘরের এনট্রপিকে বাড়িয়ে তোলে। এবারে খাতা কলম নিয়ে হিসেব কষলে দেখা যাবে পানিকে বরফ করে রেফ্রিজেটর তার ভেতরে এনট্রপি যত না কমিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়ে তুলেছে ঘরের এনট্রপি। কাজেই যোগ-বিয়োগ শেষ হলে দেখা যাবে এনট্রপির নীট বৃদ্ধি

[25] Adam Frank, 3 Theories That Might Blow Up the Big Bang, Discover, March 25, 2008
[26] Victor J. Stenger, A Scenario For A Natural Origin Of Our Universe Using A Mathematical Model Based On Established Physics And Cosmology, Philo 9(2) দ্রষ্টব্য। অনলাইন লিঙ্ক : http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Origin.pdf

ঘটেছে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র ফ্রিজের ভিতরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারে, এনট্রপি তো কমে গেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো সিসটেম (ওপেন সিস্টেম) গোনায় ধরলে দেখবে যে, এনট্রপি আসলে কমেনি, বরং বেড়েছে।

বিবর্তনের ব্যাপারটাও তেমনি। সূর্য আমাদের এ পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত শক্তির যোগান দিয়ে চলেছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবদেহে কোষের বৃদ্ধি ঘটে, এবং কালের পরিক্রমায় বিবর্তনও ঘটে। শুধুমাত্র জীবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে যে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু ঠিকমত হিসেব-নিকেশ করলে তবেই বোঝা যবে যে, এই 'আপাতঃ এনট্রপি' কমাতে গিয়ে শক্তির যোগানটা পড়ছে অনেক বেশী। কাজেই এনট্রপির আসলে নীট বৃদ্ধিই ঘটছে।

সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার উত্তরণকে যারা 'এনট্রপি কমার' অজুহাত তুলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লংঘন ভাবেন তারাও ভুল করেন। প্রকৃতিতে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উত্তরণের উদাহরণের অভাব নেই। এমনকি জড়জগতেও এধরনের 'আপাতঃ এনট্রপি' কমার উদাহরণ রয়েছে বিস্তর। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, লবনের মধ্যে কেলাস তৈরী, কিংবা পাথুরে জায়গায় পানির ঝাপটায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বিরল নয়। উদাহরণ আছে গ্যালাক্সি ফরমেশন, কিংবা স্পন্টেনিয়াস ম্যাগ্নেটিজমের। কোনটির ক্ষেত্রেই তাপগতির সূত্র ব্যহত হয়নি। কাজেই কালের পরিক্রমায় সরল জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল জীবের অভ্যুদয় কোন অসম্ভব ঘটনা নয়, নয় তাপগতিবিদ্যার লংঘন। বন্যা আহমেদ তার 'বিবর্তনের পথ ধরে' বইয়ে এ ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকদের জন্য পরিস্কার করেছেন[27]। মুলতঃ বিগত শতকে হাবলের সেই যুগান্তকারী আবিস্কারের পর যখন থেকে আমরা জানতে পেরেছি মহাবিশ্ব প্রসারণশীল, তখন থেকে আমরা জানি - স্থানিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি (localized order) তাপগতিবিদ্যার কোন লঙ্ঘন নয়, কারণ পুরো মহাবিশ্বের এনট্রপি বৃদ্ধির নিরিখে সেই স্থানিক 'আপাতঃ এনট্রপি' কমা খুবই সম্ভব।

উপরের উদাহরণগুলো ধর্মবাদীদের জন্য নিঃসন্দেহে এক ধরণের সতর্কবাণী নিয়ে এসেছে। রহস্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য সহজ সমাধান হিসেবে যারা ঈশ্বররকে গুঁজে দিতেন, কিছুদিন পরে তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়েছেন, কারণ দেখা গেছে অগ্রসর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে সে রহস্যকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। প্যালির 'ডিজাইন আর্গুমেন্ট' থেকে শুরু করে 'এনট্রপি হ্রাসের' ভ্রান্তযুক্তিগুলো সে ব্যাপারটিই আমাদের কাছে পরিস্কার করে দেয়। এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়।

এগারো শতকের ভারতীয় দার্শনিক উদয়ন আচার্য (Udayana) ঈশ্বর থাকার 'প্রমাণ' হিসবে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। আমরা সেগুলো বিবেচনায় আনতে পারি। প্রথমতঃ উদয়নের মতে আমাদের চেনা জানা বস্তুজগতের সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। তার মতে কেউ না কেউ এই বস্তুজগত তৈরি করেছে।

[27] বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭, বইটির পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সেই সত্ত্বাই ঈশ্বর[28]। এখন আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জ্ঞানের সাপেক্ষে আমরা জানি, সব কিছুর পেছনেই কারণ থাকার ব্যাপারটি কোন ধ্রুব সত্য নয়। এটোমিক ট্রান্সিশন, রেডিও এক্টিভ ডিকে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যেগুলো 'কারণ বিহীন ঘটনা' হিসেবে স্বীকৃত। আর তাছাড়া, সব কিছুর পেছনে যদি কারণ থাকেই, তাহলে ঈশ্বরের পেছনে কেন কোন কারণ থাকবে না, সেটাও তো পরিস্কার করে বলা চাই।

ঈশ্বর থাকার দ্বিতীয় 'প্রমাণ' হিসবে তিনি যা বলতেন তা আজকের দিনে তেমন একটা শোনা যায় না। বিষয়টা একটু প্যাঁচালো। উদয়ন বলতেন, সব কিছুই তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে, এবং বিভিন্ন পরমাণু মিলে বড় বস্তু তৈরি করে। কিন্তু সেই বন্ধন নিজে নিজে তৈরি হতে পারে না, সেই বন্ধন তৈরি হয় সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপে। কিন্তু আজকের জ্ঞানের সাপেক্ষে আমরা জানি এটি মিথ্যা। আমরা জানি পরমানুর মিথস্ক্রিয়ার নানা সুত্রাবলী (laws of atomic interactions) রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা পরমাণুর বন্ধনকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে। বিজ্ঞানের যে শাখায় বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় তার নাম – 'রসায়ন' (chemistry)। রসায়নের নিয়মনীতি অনুসরণ করে কিভাবে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি হয়, তা আজকের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও বলতে পারবে।

তার তৃতীয় 'প্রমাণ'টি ছিল পৃথিবীর শুন্যে ঝুলে থাকার সমাধান হিসবে। উদয়ন তখনকার জ্ঞানের সাপেক্ষে ভাবতে পারেননি কিভাবে আমাদের এই পৃথিবীটা শুন্যে ঝুলে আছে। তিনি মনে করতেন কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছে। তিনিই ঈশ্বর। আজ আমরা জানি, মাধ্যাকর্ষন সূত্র সহজেই পৃথিবীর এই শূন্যে ঝুলে থাকাকে ব্যাখ্যা করতে পারে; কোন অদৃশ্য সত্ত্বার দারস্থ হতে হয় না।

উদয়নের চতুর্থ 'প্রমাণ'টি ছিল মানব দক্ষতার অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। এই 'প্রমাণ'টি অনেকটা আজকের দিনে এরিক ফন দানিকেনের 'প্রমাণের' মত। কেউ আমাদের না দেখিয়ে দিলে আমরা কিছু করতে পারতাম না। এই যে সভ্যতার অগ্রগতি – এটা এমনি এমনি ঘটে নি, কেউ না কেউ উপর থেকে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, বলে দিয়েছে। কোন উপরওয়ালা ছাড়া মানব সভ্যতা এগোয়নি কিংবা এগুতে পারবে না এ ব্যাপারটা কে বলল? এটার বিরুদ্ধে এত যুক্তি দেওয়া যায় যে, আজকের দিনে এটা আদপে কোন যুক্তি নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

পঞ্চমতঃ উদয়ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গুলোকে ঐশ্বরিক ভাবতেন। তিনি মনে করতেন বেদ এক প্রমান্য ধর্মগ্রন্থ। কোন মানুষের পক্ষে বেদ লিখা সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের দিনের জ্ঞানের সাপেক্ষে আমরা জানি, বেদ সেরকম কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়, বরং সে সময়কার মুনি ঋষিদের চিন্তাভাবনার সংকলন বলা যেতে পারে। বেদের অনেক কিছুই আজকের জ্ঞানের সাপেক্ষে অবৈজ্ঞানিক, সেকেলে এমনকি অমানবিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারপর উদয়ন কিংবা তার মত কেউ বেদ কিংবা অন্য ধর্মগ্রন্থকে 'ঐশ্বরিক' ভাবতে পারেন, কিন্তু তাতে করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না।

[28] উদয়নের এই প্রথম 'প্রমাণ'টি অনেকেটা পশ্চিমা বিশ্বে 'কালাম কসমোলজিকাল আর্গুমেন্টের' সমতুল্য, যেখানে ঈশ্বরকে 'আদি কারণ' হিসেবে দেখানো হয়েছে। কালামের যুক্তিমালার খন্ডন এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

উদয়নের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, আগেকার দিনের চিন্তাশীল মানুষেরা বিভিন্ন যুক্তি সাজিয়ে ঈশ্বারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু সফল যে হয়েছিলেন তা বলা যাবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ওই 'প্রমাণ'গুলো নিজে নিজেই অপাংকক্তেয় হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও 'বিশ্বাসীদের থলিতে' ঈশ্বারের অস্তিত্বের স্বপক্ষে আরো অনেক কিম্ভুতকিমাকার 'প্রমাণ' আছে। এর অনেকগুলোই খুবই হাস্যকর এবং খেলো। যেমন, ইতালীর ক্যাথলিক পাদ্রী থমাস একুনিয়াস (Thomas Aquinas) ঈশ্বরের অস্তিত্বের 'প্রমাণ' হিসেবে বলতেন –

> "আমরা জানি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তুর গুণ অবস্থা ভেদে ভিন্ন। যেমন, ভালোত্ব কিংবা উৎকর্ষতা ব্যাপারটা ডিগ্রি বা মাত্রার উপর নির্ভরশীল। আমরা ভালোত্ব এবং উৎকর্ষতাকে পরিমাপ করতে পারি এক পরম বা সর্বোচ্চ মানের সাপেক্ষে। মানুষের মধ্যে ভালো খারাপ দুইই আছে। কাজেই মানুষের মধ্যে ভালত্বের সর্বোচ্চাবস্থা (absoulute goodness) থাকতে পারে না। সুতরাং এমন কোথাও নিশ্চয় আছে যেখানে ভালোত্ব কিংবা উৎকর্ষতা থাকবে মানের সর্বোচ্চ স্কেলে। সেটাই ঈশ্বর"।

কিন্তু এটা কি কোন 'যুক্তি' নাকি? অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তাঁর সাম্প্রতিক 'গড ডিলুশন'[29] বইয়ে এর জবাব দিয়ে বলেন,

গায়ের দুর্গন্ধও তো মানুষ ভেদে ভিন্ন হয়। তাহলে নিশ্চয় কোথাও এমন কেউ আছেন যিনি দুর্গন্ধের চুড়ান্ত। সেই পরম গন্ধমাধবই হচ্ছেন ঈশ্বর। কেমন শোনায় এখন?

অতি সম্প্রতি বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় মতবাদটি হল : 'বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্প' বা Intelligent Design Argument। এটি মূলতঃ প্যালির ডিজাইন যুক্তিরই বর্ধিত রূপ। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন কিছু পরিবর্ত্য রাশির (variables) সুক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে যে এই সমন্বয়ের একচুল হের ফের হলে আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হত না। এর অর্থ হল সৃষ্টির এক পর্যায়ে ঈশ্বর প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই সুপ্ত ইচ্ছেটা মনে রেখে তিনি মহাবিশ্ব তৈরী করলেন, আর এ কারণেই আমাদের মহাবিশ্ব ঠিক যেমনটি আছে তেমন- এত নিখুঁত ও সুসংবদ্ধ। ব্যাপারটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ধরা যাক মহাকর্ষণের কথা। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে একটি ধ্রুবক স্বতঃভাবেই উদয় হয়- যাকে আমরা বলি মহাকর্ষ ধ্র"বক, G (Gravitational constant)। সেই সূত্র থেকে দেখা যায় যে দুটি বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণ নির্ধারিত হবে ঐ মহাধ্র"বকের সংখ্যাবাচক মান দ্বারা। যদি ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত তাহলে দুটি কণিকার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণও বদলে যেত। সাদা চোখে ব্যাপারটি সামান্য মনে হতে পারে। আকর্ষণ বলের তারতম্য ঘটলে এমন কি এসে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এটি সামান্য নয়- এর একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব পরবে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। তাঁরা বলেন যে ঐ মহাকর্ষ ধ্রুবকের বর্তমান মান আসলে আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ধ্রুবকটির মান অন্যরকম

[29] Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin, 1 edition (2006)

হলে তারকাদের মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে বদলে দিত। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই মহাকর্ষ ধ্রুবকের উপরই অবশ্য নয়, মহাকর্ষ ও দুর্বল নিউক্লিয় বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে দুর্বল নিউক্লিয় বলের শক্তি যদি সামান্য একটু বেশি হত, এই মহাবিশ্ব পুরোটাই অর্থাৎ শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেন পরমাণুতে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটোরিয়াম (এটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মামাতো ভাই, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'আইসোটোপ') হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার এর উল্টোটি ঘটলে, অর্থাৎ দুর্বল নিউক্লিয় বলের শক্তিমত্তা আর একটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে কেবল থাকত শতকরা একশ ভাগ হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ ধরণের দুই চরম অবস্থার যে কোন একটি ঘটলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজী তৈরি হওয়ার মত অবস্থা কখন সৃষ্টি হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে 'কার্বন-ভিত্তিক' প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে ইলেকট্রনের ভর নিউট্রন ও প্রটোনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম। তারা মনে করেন যে এর ফলে একটি মুক্ত নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও প্রতি-নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশি হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপাদিত সকল প্রটোন ও ইলেকট্রন মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হত। এর ফলে যা ঘটত সেটি আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। এমনতর পরিস্থিতিতে খুব কম পরিমাণ হাইড্রোজেন টিকে থাকত, আর তাহলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জালানী অবশিষ্ট থাকত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরণের রহস্যময় নানা যোগাযোগ তুলে ধরে একটি বই লিখেছিলেন ১৯৮৬ সালে, নাম 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল কিংবা অন্য মহাজাগতিক ধ্রুবকসমূহের মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে এর উত্তর পেতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের আবির্ভাবের মধ্যে। প্রাণের বিকাশ ও সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অভ্যুদয়ের জন্য এসব মৌলিক ধ্রুবকও পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান ঠিক এমনই হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল, আর সেজন্যই ধ্রুবকগুলির মান এ রকম হয়েছে। হঠাৎ করে বা দৈবক্রমে এটি ঘটে নি, বরং এর পেছনে বিধাতা পুরুষের একটি সুস্পষ্ট ইচ্ছা নিহিত ছিল। মানুষের অভ্যুদয়কে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-নীতি-সূত্রসমুহের ব্যখ্যা করার এই প্রয়াসকে বলা হয় 'Anthropic Argument' বা 'নৃ-কেন্দ্রিক যুক্তি'।

এ ধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলেও অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ এ ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হয়েছে যে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। যেমন প্রায়শঃ বলা হয় যে পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি যথাযথ অনুপাতে না থাকত, তবে প্রাণের বিখাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীর কক্ষ-তল বিষুববৃত্তের তলের সাথে ২৩.৫ ডিগ্রী হেলে আছে, তার একচুল এদিক-ওদিক হলে তাপ ও চাপের অনুপাতের এমন তারতম্য দেখা দিত যে প্রাণের উন্মেষ একটি অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই আছেন যাঁরা প্রাণের এ ধরনের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার সাথে একমত নন। এঁদের মতে 'আমরা এ ধরণের সর্বোত্তম' পরিবেশে উদ্ভুত হয়েছি বলেই আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক এ ধরনের পরিবেশই লাগবে। অর্থাৎ বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড

ইত্যাদির উপস্থিতি, আবহমণ্ডলের চাপ, তাপ ইত্যদি পরিবেশ নির্ধারক পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান বর্তমানে যা আছে তা না থাকলে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না, ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা- প্রমাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন রক্ষার অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নিচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রেও গভীর তলদেশে, এমনকি কেরোসিন তেলের ভেতরের বৈরি পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে যে ধরনের পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের পরিচিত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোন মিলই নেই। কাজেই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্র"বক আর পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান অন্য রকম হলে মহাবিশ্বে প্রাণের অভ্যুদয় ঘটত না। খ্যাতনামা জ্যোতির্পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেংগর তাঁর 'The Unconscious Quantum' বইটিতে দেখিয়েছেন যে মহাজাগতিক ধ্রুবক আর পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান পরিবর্তন করে আমাদের মহাবিশ্বের মত আরও অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য 'ফাইন টিউনিংয়ের' কোন প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারটি বুঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলো নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'Anthropic coincidence' ঘটানো যায় কোন ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোন ছেলেখেলা নয়, বরং রিচার্ড ক্যারিয়ারের[30] ভাষায়, একটি সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট', যা Philo জার্নালে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে[31]। আমি নিজেও ড. স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তাঁর ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই তিনি যখন বলেন, "বর্তমান জ্ঞানে এমন কোন ভিত্তি নেই যাতে সুক্ষ্ম সমন্বয়বাদীরা অনুমান করতে পারেন যে একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ, অসম্ভাব্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ প্যারামিটার ছাড়া জীবন সৃষ্টি অসম্ভব" - তখন তাঁর এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করা যায় না। এছাড়াও 'Physical Review' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বিজ্ঞানী অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত্যরাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোন একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব- কোন ধরনের 'Anthropic Argument' এর আমদানি ছাড়াই[32]।

'ফাইন টিউনিংয়ের' বক্তব্যের সমালোচনা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর 'পরিকল্পত মহাবিশ্ব' শিরনামে লেখা প্রবন্ধে বলেন[33]:

> 'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কতিপয় ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সুক্ষ্ম সমন্বয় ঘটেছে যেগুলো জীবন তৈরির সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পনা করে বিজ্ঞানের সব রহস্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এ ধরণের সুক্ষ্ম সমন্বয় ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই। '

[30] রিচার্ড ক্যারিয়ার- প্রখ্যাত যুক্তিবাদী, বিতার্কিক, secular web এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক, ইতিহাসবিদ।

[31] "Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." *Philo* 3(2000): 50-67.

[32] Anthony Aguirre, "The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments", Journal of Physical Rev, D64:083508, 2001.

[33] পূর্বোক্ত

তিনি কার্বন তৈরির পেছনে অ্যানথ্রোপিক যুক্তির চাইতে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এছাড়া আদ্রে লিন্ডে, অ্যালেন গুথ প্রমুখের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে ইনফ্লেশন বা স্ফীতিতত্ত্বের সাম্প্রতিক ফলাফলগুলোও তথাকথিত 'ফাইন টিউনিং' এর বিরুদ্ধে গেছে। এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কি হচ্ছে?' প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে।

এই আপাত চমকদার বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উৎসাহের সাথে ইদানিং ব্যবহার হরা হচ্ছে জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফাইন টিউনাররা দেন ঠিক উল্টো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফাইন টিউনাররা ঠিক এর বিপরীত কথা বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ-সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবেই সৃষ্ট হতে পারে না। একই সাথে দুই বিপরীত মেরুর কথা তো সত্য হতে পারে না। মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক্টর স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্সসহ অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে ফাইন টিউনিং বা অ্যানথ্রোপিক যুক্তিগুলি আসলে সেই পুরান 'গড ইন গ্যাপসের' যুক্তিবাদেরই নব্য সংস্করণ। যেখানে রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে টেনে আনা হচ্ছে। এভাবে মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে মানুষকে আত্মসমর্পণে উৎসাহী করা হচ্ছে। এ কারণেই রিচার্ড ডকিন্স তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেন[34]:

> সারল্য থেকে কিভাবে জটিলতার উদ্ভব ঘটে তার ব্যখ্যা বিজ্ঞান আমাদের কাছে হাজির করে। কিন্তু 'ঈশ্বরের অনুকল্প' কোন কিছুর জন্যেই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ আমরা যা কিছুর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি এই অনুকল্প তা স্বীকার করে নেয়।

বস্তুত অনেক বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন যে, মহাবিশ্ব মোটেই আমাদের জন্য 'ফাইন-টিউন্ড' নয়, বরং আমরাই মহাবিশ্বে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে ফাইন-টিউন্ড করে গড়ে নিয়েছি। অর্থাৎ সহজ কথায়- "মহাবিশ্ব মনুষ্যত্বের জন্য সুক্ষ্মভাবে সুসমন্বিত নয়, বরং মনুষ্যত্বই মহাবিশ্বের সাথে সুক্ষ্মভাবে সুসমন্বিত" । ব্যাপারটা হয়তো মিথ্যে নয়। আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত সীমার তাড়িতচৌম্বক বর্ণালীতে কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল আমাদের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুছে। কাজেই সেই আবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চোখের গড়ন সে ভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। পুরো ব্যাপারটিকে আবার অন্য কেউ উল্টোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। যেমন তিনি বলতে পারেন যে ঈশ্বর আমাদের চোখকে লোল-বেগুনী সীমায় সংবেদনশীল করে তৈরি করবেন বলেই বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে

[34] A lecture by Richard Dawkins extracted from The Nullifidian (Dec 94), (http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/World of Dawkins-archive/ Dawkins/ Work/Articles/1994- 12religion.shtml

এই সংকীর্ণ পরিসরেরর (অর্থাৎ লাল থেকে বেগুনী) আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাকরণ কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুরবার মতই শোনায়। এর পরও সুক্ষ্ম সমন্বয়কারীরা ঠিক এ ধরণের যুক্তি দিতেই পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলি কেন এ ধরনের মান গ্রহণ করল এর বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা না খুঁজে- তা 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এ ধরণের যুক্তি উত্থাপন করে থাকেন।

প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বিগ-ব্যাংয়ের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরও ৬০০ কোটি বছর কাটিয়েছিলেন পৃথিবীতে 'মানুষের অভ্যুদয়' ঘটাতে- এর কি কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলে? পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস-পরিক্রমায় আমরা তো আজ জানি যে মানুষ পুরো সময়ের মাত্র একশ' ভাগের এক ভাগের কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন? এছাড়া প্রাণ কিংবা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বলতেই হয় মহান ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির চেয়ে অপচয়ই করেছেন বেশি। কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী নামক সাধারণ একটি গ্রহে প্রাণ সৃষ্টি করতে গিয়ে অযথাই সারা মহাবিশ্ব জুড়ে তৈরি করেছেন হাজার হাজার, কোটি কোটি, ছোটবড় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ- যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সাহারা মরুভূমির চেয়েও বন্ধ্যা, উষর আর প্রাণহীন। শুধু কোটি কোটি প্রাণহীন আর নিস্তব্ধ গ্রহ, উপগ্রহ তৈরি করেই ঈশ্বর ক্ষান্ত হননি, তৈরি করেছেন অবারিত শূন্যতা, গুপ্ত পদার্থ এবং গুপ্ত শক্তি- যেগুলো নিষ্প্রাণ তো বটেই, প্রাণ সৃষ্টির কল্পিত মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই বেমানান। ঈশ্বরের সৃষ্টি যদি এত 'নিখুঁত'ই হবে তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন এত অর্থহীন অপচয়?

আসলে 'ঈশ্বর নির্ধারিত মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছে না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে আসছি। আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটি কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র- এটি না সৌর জগতের না, না মহাবিশ্বের কেন্দ্র। আর এ সত্যটি গ্রহণ করতে আমাদের লেগেছে অনেক দিন। ভূকেন্দ্রিক মডেলের স্থানে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞান সাধনাই যথেষ্ট ছিল না, এর জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখ মুক্তচিন্তার মানুষকে সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব (১৮৫৯) উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ এ তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বিশেষ সৃষ্টি মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়। আর এ কারণেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভেবে নিজেকে সৃষ্টির মধ্যমণি করে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝে বসিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। ফাইন টিউনিং ও অ্যানথ্রোপিক যুক্তিগুলি এ জন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয়।

সত্যি বলতে কি মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' প্রয়োজন একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণা মাত্র, এটিকে কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা তত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও বিশ্বাসই এর আসল ভিত্তি।

অনেক বিজ্ঞানীই ব্যক্তিগতভাবে ধর্মভীরু হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পরিধিতেই সীমাবদ্ধ রাখেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে জড়িয়ে ফেলেন না। তাঁরা নিরাসক্তভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, এবং বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে বিজ্ঞানীরা এগুচ্ছেন। তার পরেও এটি স্বীকার করতে হয় যে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে অনেক জায়গাতে এখনও 'ফাঁক' বা অপূর্ণতা রয়ে গেছে; অসমাধিত রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যেমন, আমরা এখনও জানি না পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি কিভাবে এক সময় তৈরী হল, আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি সৃষ্টির সূচনায় প্রকৃতি কেন প্রতি-কণিকার তুলনায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল কণিকাদের প্রতি, কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রেই বা কি রয়েছে, কেনই বা মহাবিশ্ব ত্বরিত হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের মত কি আরো অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে? বিগ-ব্যাংয়ের পূর্বে স্থান বা কালের কি কোন ধারণা করা যায়? এ ধরণের নানা প্রশ্ন আমাদের মনকে নাড়া দেয়। আবার মহান একীভূত তত্ত্ব বা সার্বিক একীভূত তত্ত্বের স্বপক্ষে এখনও পরীক্ষণলব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি, স্থূলজগৎ ও আণুবীক্ষণিক জগৎ নির্বিশেষে আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক মেল-বন্ধন আমরা এখনও ঘটাতে পারিনি। এ ধরনের প্রান্তিক প্রশ্ন এবং সমস্যাগুলো হয়তো সাময়িকভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন কি করে প্রহেলিকা কাটাতে হয়, কীভাবে মানুষকে আলোকিত করতে হয়। যুগ যুগ ধরে আমরা তাই দেখে এসেছি। সেজন্যই তাদেরকে আমি আমার বইয়ে আখ্যায়িত করেছি আলোর প্রদীপ হাতে চলা আঁধারের যাত্রী হিসেবে। বিজ্ঞানীদের এই নিবিড় সাধনায় ঈশ্বরের 'আলৌকিত্ব', কিংবা সাঁইবাবা অথবা সাঈদির মত ঐন্দ্রজালিক ব্যবসার কোন স্থান নেই, এমন কি বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ঈশ্বর-বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের স্থানও এখানে গৌণ[35]। সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের কাজ হল স্বমেধা উৎক্ষরিত তত্ত্ব, মডেল আর পরীক্ষণের ভিত্তিতে মহাবিশ্ব ও প্রকৃতির রহস্যকে অনুধাবন করে সত্যকে উদঘাটন করা।

আমি আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটি শেষ করেছিলাম একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি পড়েছিলাম বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার 'হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান' সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ থেকে[36]। এ প্রবন্ধটিও আমি শেষ করছি সেই ঘটনাটির পুনরুল্লেখ করে। বর্ণিত ঘটনাটি এরকম:

[35] পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা, এই প্রশ্নটি সাধারণ পাঠকদের কাছে সব সময়ই একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হিসেবে গণ্য হয়, যদিও এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যতা কখনই নির্ভর করে না, নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লব্ধ প্রমাণের ওপর। যা হোক, ১৯৯৮ সালে করা একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের (National Academy of Science) তালিকাভুক্ত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ বিজ্ঞানী ব্যক্তি-ঈশ্বরে (Personal God) বিশ্বাস করেন বাকি ৯৩ শতাংশের মধ্যে ৭২.২ শতাংশ সরাসরি নাস্তিক (Atheist) বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের অভিহিত করেছেন, এবং ২০.৮ ভাগ অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Edward J. Larson and Larry Witham, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313, (1998). ;http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html

[36] আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম : অনিলবরণ রায়ের সমালোচনার উত্তর, মেঘনাদ সাহা, মেঘনাদ রচনা সংকলন (শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ১২৭-১৬৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ১৯০৮ শকাব্দ (২য় সংস্করণ)।

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লাপ্লাস তার সুবিখ্যাত 'Mechanique Celeste' গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষিত সকল গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দান সম্ভব। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়নকে উৎসর্গ করার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন, তখন নেপোলিয়ন রহস্য করে বলেন:

> 'মসিঁয়ে লাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?'

লাপ্লাস উত্তরে বললেন:

> 'Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese' অর্থাৎ- 'Sire, I have no need of that hypothesis.' (এই অনুকল্পের কোন প্রয়োজন আমার কাছে নেই)।

[প্রবন্ধটি 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' (অঙ্কুর প্রকাশনী)র সপ্তম অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। ২০০৫ সালে প্রথম প্রকাশ এবং ২০০৬ সালে বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশের পর নতুন কিছু বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের সাপেক্ষে ঈষৎ পরিবর্তিত এবং বিবর্ধিত]

***

টিকাঃ

অক্কামের ক্ষুর

অক্কামের ক্ষুরকে দর্শন শাস্ত্রে অনেক সময় 'মিতব্যয়িতার নীতি' (Principle of Parsimony/Economy) কিংবা সরলতার নীতি (Principle of Simplicity) হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে এর মূল নীতিটি হল :

Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not be posited without neccssity).

বাংলা করলে দাঁড়ায়-
'অনাবশ্যক বাহুল্য সর্বদাই বর্জনীয়'।

এই নীতি প্রয়োগ কিন্তু বিজ্ঞানে, ধর্মে, দর্শনে খুবই ব্যাপক। যেমন- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'অক্কামের ক্ষুরের' প্রয়োগ হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীরা 'অক্কামের যে মূল নীতিটি অনুসরণ করেন তা হল- 'যদি দুটি বৈজ্ঞানিক মডেল একই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত সহজ মডেলটি সমাধান হিসেবে গ্রহণ কর।' যেমন, একটা সময় গ্রহদের অনিয়ত-গতিপ্রকৃতি জ্যোর্তিবিদদের কাছে বড় ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কেপলার এই সমস্যা সমাধান করতে আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন তিনটি সূত্র। আর পরবর্তীতে একই সমস্যা সমাধানা করতে গিয়ে কেপলারের তিনটে নিয়মের বদলে নিউটন আমাদের দিলেন একটি মাত্র সূত্র- 'মহাকর্ষীয় ব্যস্তবর্গীয় নিয়ম' (nverse Law of Gravity) - যা দিয়ে গ্রহ উপগ্রহের চলাচলজনিত সমস্যাগুলোর একটা সহজ সমাধান পাওয়া গেল। দেখা গেল, এই নিয়ম থেকে কেপলারের নিয়মগুলো স্বতঃসিদ্ধভাবেই বেরিয়ে আসে। কাজেই যখন থেকে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটিকে 'বৈজ্ঞানিক মডেল' হিসেবে গ্রহণ করা হল, কেপলারের বাকি সূত্রগুলো 'অনর্থক বাহুল্য' হিসেবে পরিত্যক্ত হল সঙ্গত কারণেই। এটিই অক্কামের সূত্রের একটি খুবই সার্থক প্রয়োগ।

অক্কামের ক্ষুরের আরেকটি সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় ইথারের ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞানীরা আলো চলাচলের জন্য মাধ্যম হিসেবে 'ইথার' নামক একটি অদৃশ্য, ঘর্ষণহীন, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং 'সর্বভূতে বিরাজমান' এক রহস্যময় পদার্থ কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল শব্দ চলাচলের জন্য যেমন মাধ্যমের প্রয়োজন, তেমনি আলো চলাচলের জন্যও একটি মাধ্যম থাকতেই হবে। তারা ধরে নিয়েছিলেন এই পুরো মহাবিশ্বটাই ডুবে রয়েছে ইথারের এক অথৈ মহাসমুদ্রে। আর এর ফলেই আলো অনেকটা শব্দের মতই তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৮০ সালে মাইকেলসন-মর্লির বিখ্যাত পরীক্ষা আর তারও পরে ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' তাত্ত্বিকভাবে ঈথারের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিল। গন্ধহীন, স্পর্শহীন রহস্যময় 'ইথার' 'অহেতুক বাহুল্য' হিসেবে পরিত্যক্ত হল।

অক্কামের ক্ষুরের ব্যবহার দর্শনেই ব্যাপক। নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা, অক্কামের ক্ষুরের প্রয়োগে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, ঈশ্বরের অনুমান নিতান্তই একটি অপ্রয়োজনীয় অনুকল্প। যেমন- নিম্নোক্ত দুটি হাইপোথিসিস বিবেচনায় আনা যাক।

- আমাদের সামনে এক জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, যেটি প্রাকৃতিক নিয়মে (Natural Process) উদ্ভুত হয়েছে।
- আমাদের সামনে এক জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং একজন 'ঈশ্বর'ও রয়েছেন যিনি এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন। এখানে 'ঈশ্বর' স্বভাবতই একটি পৃথক সত্ত্বা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

যদি এই দুইটি পথের মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে হয়, তবে 'অক্কামের সূত্র' এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করতে বলবে- অর্থাৎ প্রথম সমাধানটি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

কেউ কেউ অবশ্য তৃতীয় একটি সমাধানকে অপেক্ষাকৃত সহজ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন-

- আমাদের সামনে কোন জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নেই- আসলে সবই মায়া আমাদের কল্পনা!

তবে এই তৃতীয় সমাধানটি আমাদের সলিপসিজমের (Solipsism) এর পথে নিয়ে যায় যা অধিকাংশ যুক্তিবাদীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

'অক্কামের ক্ষুর' মধ্যযুগীয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। 'অক্কামের ক্ষুর' নামক এই উদ্ভট পরিভাষাটি আসলে এসেছে ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম অকহামের (William Ockham, ১২৮৫ -১৩৪৯) এর নাম থেকে। অকহাম নিজে যদিও এই সূত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন না, তবে এই সূত্রটি তিনি প্রায়শই বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতেন বলে শোনা যায়। আর সেজন্যই তার নাম এই সূত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে এখন জড়িয়ে রয়েছে। আমি অবশ্য জানি না যে, নাপিতের 'দাঁড়ি কামানোর ক্ষুরের' মত ভয়ঙ্কর একটা কিছুর আদলে তার নাম নিয়ে এই উদ্ভট পরিভাষা সৃষ্টির সাথে তিনি একমত হতেন কিনা, তবে তিনি চান বা না চান তার নামটি কিন্তু বিখ্যাত এই সূত্রের সাথে আজ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে রয়েছে।

রসিকজনেরা কিন্তু এই সূত্রটি নিয়ে নানা ধরনের রসিকতা করতেও ছাড়েননি। যেমন- কেউ কেউ এই সূত্রটিকে অভিহিত করেন 'Kiss' সূত্র (Keep it simple, stupid) হিসেবে। কেউবা এই সূত্রটির নির্যাসকে তুলে ধরেন এভাবে-

> 'যখন কোথাও ঘোড়ার ডাক শোন, তখন ঘোড়ার কথাই মাথায় রেখো, জেব্রা বা জিরাফের নয়'।

বিখ্যাত চিত্রকর ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২ - ১৫১৯) ছিলেন অকহামের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তিনিও তার মত করে একটি 'অক্কামের ক্ষুর' তৈরি করেছিলেন। তাঁর রচিত 'অক্কামের ক্ষুরটি' ছিল এ রকম-

> "Simplicity is the ultimate sophistication"

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com